রহস্য খোলার রেঞ্চ
কাজল শাহনেওয়াজ

[স্ব] ঋণা শাহনেওয়াজ

প্রথম প্রকাশ: ৮ ফাল্গুন, ১৩৯৮/ ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৯২

বিকল্প কবিতা প্রকাশনী
৯, ফ্রীস্কুল স্ট্রীট, ঢাকা-১২০৫
মূল্য: ১২ টাকা

RAHOSYA KHOLAR WRENCH

সূচি

চিড়িয়াখানা

আমার সাথে মুন্সিগঞ্জের সেনেটারি ইন্সপেক্টর, গোপালগঞ্জের স্বাস্থ্যসহকারি, পিরোজপুর পৌরসভার দুজন ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরে চিড়িয়াখানা দেখছে। পিরোজপুরের সহকারি সাহেব তার কালো জুতা থেকে মিরপুরের লালমাটি সরাতে সরাতে বলে, 'সুন্দরবনে এ রকম হরিণ আমার নিজের হাতে বহুবার মেরেছি, জানেন, হরিণের মাংশ খুব ভারী' - আমি শ্রদ্ধায় আবেগআপ্লুত হয়ে পড়ি তার লালচের কথা শুনে। যে মুখে বললো বিগত প্রায় সেই সব হরিণের কথা - হরিণের রান্না করা লালচে গোশত এ মুখেই বহুবার খেয়েছি নিশ্চিতভাবে বলা যায় -

এরা সবাই বিভিন্ন জেলা শহরের পাদপিঠ থেকে এসেছেন তা বলে কোন গর্ব নেই কারো চোখে মুখে -

নতুন মেহমান যেমন করে থাকে। গত দশদিন শহরের ট্রেনিং একাডেমির ডর্মে কাঁচা তরিতরকারীর বাসি চেহারার মতো দিন ও রাত কাটিয়ে আজ বিকালে এরা ধনেশের নকল গাম্ভীর্য নিয়ে ছুটছে।

লক্ষ্য করে শুনি নিজেদের মধ্যে জানোয়ারের কথাবার্তা ছেড়ে ওরা অন্য একটি বিষয় নিয়ে খুব তৎপর হয়ে পড়লো। গোলাপগঞ্জের গোপালবাবু মুন্সিগঞ্জের চল্লিশোর্ধ উঁচু হিল পরা নিতান্ত নিরিহ রাজ্জাকুর রহমানকে বলছে, 'ভাই রেজ্জাক, ঐ মেয়ে ভাল্লুকটার শাড়ির বাহার দ্যাখছেন, ইশশরে...'। এই সময় একটি অতিকায় জলহস্তি ঝামাইটের রোদে শুয়ে নাক ডাকছিলো। একজন কে যেনো নিতান্ত তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলে, 'দ্যাখেন, মইষ'।

শুক্রবারের বিকালে জানোয়ার দেখতে কত বিচিত্র রকম মানুষ এসেছে। চাঁদপুরের হাই ব্লাডপ্রেসারে কাতর ইনসান আলি, সিরাজগঞ্জের খোদাবক্স মৃধা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আবুর উদ্দিন, হবিগঞ্জের গোলবার হোসেন। সবাই চাকুরে, সবাই নিজের বাড়িতে থেকে চাকরি করেন -

জিরাফ দেখতে দেখতে নবুর উদ্দিন বিস্ময়ে বলে ওঠে 'রাতে এরা কি ঘুমায়?' উট পাখির গোলাপি রান দেখে আমুর উদ্দিন মুর্চ্ছা যেতে চান, না জানি রোষ্ট হলে কত জনে এটা খেতে পারবে?

কাকাতুয়ার সাতরঙা ঝিলকানো সাদা পালক দেখে কিশোরগঞ্জের তারকেশ্বর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, বিষ্ফারিত চোখে শুধু পাখিটিকেই দেখতে থাকে একা একা, আর আমরা দেখি - দুটি হাত কপালে ঠেকিয়ে বিরবির করে কি যেন বলছে তারকেশ্বর। দেখে আমাদেরও একটু খানিক ভাব মতো হয়, আমরা তার চতুর্দিকে গোল করে দাঁড়াই।

একটু দূরে বাঘের খাঁচায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার তার লেজের চাবুকে মধ্যবিত্ত জনকজননীর শিশুকে ভয় পাওয়াচ্ছে।

তারকেশ্বরকে কেন্দ্র করে আগৈলঝারা হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম তের রকমের তেরটা লোক। দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভাবলাম তুচ্ছ একটা জীবনের মোটা চালের ভাতের ভেতর দিয়ে বড় হয়ে এসে হঠাৎ এই বিকেলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

তারকেশ্বরের বাঙলা নোনা ধরা চোখ কাকাতুয়া দেখতে দেখতে উপচে পড়ছে। আমরা দেশলাই থেকে সিগারেট ধরাচ্ছি - সবার হাতেই দেশলাই, তেরটা ম্যাচ বাক্সের তেরটা কাঠি ঘষছি তের জন লোক - নিঃশব্দে ঠান্ডা ভাবে, যেনো ম্যাচের বারুদ নিবিড়তা ভেঙ্গে চিৎকার করে না ওঠে।

পুরুষ মানুষের বিভিন্ন রকম সাইজ

তার জুতার সাইজ ৫। মোজা ৯।
প্যান্ট ৩২। অ্যান্ডি ৩৪।
বেল্ট দেড়। এক্সেল সার্ট।
গেঞ্জি ৩৪। লেন্স -১.৭৫।

জুতার রং কালো। মোজা ছাই লাল।
প্যান্ট ধুসর। অ্যান্ডি ডোরা কাটা।
বেল্ট কালচে খয়ের। সার্ট ফেডি পোড়ামাটি।
গেঞ্জি চাঁপা সাদা। চশমা পরীদের সোনালী।

জুতা ও বেল্ট পশুত্বকের। মোজা প্যান্ট
অ্যান্ডি সার্ট ও গেঞ্জি বিভিন্ন ধরনের
কার্পাস তন্তুতে বোনা।
শুধু চশমাটি খনিজ ধাতুর।

মোজা বেল্ট অ্যান্ডি সার্ট ও গেঞ্জি দেশে বানানো
জুতা প্যান্ট ও চশমা বিদেশে বানানো।

এই সমস্ত কিছু তার শরীরে সেলাই করে ও স্ক্রু বল্টু দিয়ে আটানো।

পুরুষ মানুষের কতো রকমের সাইজ।
যত সাইজ ততো মাত্রা।

আগুনের কি হবে

একদা যা ছিলো টানাটানি করা বিকেল
দিনের দু:সহ চাপে টলে উঠেছে তার নিকেল
দীর্ঘশ্বাসের ঘন্টা কি যে টলোমলো
আজ এই বিকেলের কি যে হলো

আমার সিল্কের ঘর ভরে গেলো গিজ গিজ করা অদ্ভুত ভিড়ে
কুৎসিত ছাপমারা হাড়গিলে বামন
হাসতে হাসতে বিঁধে নিচ্ছে নিজেদের মরমি তীরে
উদ্ভিদ বিষয়ক যতো বই। শৈশবের পেরেক
আমার উভচর বৃষ্টি প্রপাত
কাগজের ফাঁকে জমিয়ে রাখা নির্ঘুম রাত্রিদিন
আমার গল্পের জুতা মোজা কঠিন জীবনের জয়গান

আমার ময়দানের আলফা প্রক্সিমা আর আটপৌরে চাঁদ
সব নাকি কবেই নিলামে উঠেছে।
দেখি গোল হয়ে সেজেছে ঋণের মাকড়শা রানী
আমি যা ধরে আছি সব যেন ধরনীর সমর্থনহারা ফাঁদ
দেখি তাকিয়ে দেখি চোখ মেলে দেখি আর্তনাদ করে দেখি
লম্পটের চাঁদোয়া তলে আমি কি বিশুদ্ধ পাখী

সব টেনে নিচ্ছে সব হারিয়ে যাচ্ছে কতোদিনের পাওনাদারের হাতে
যত করেছি দেরী মন মাতানো আলাপ ভালোবাসার সাথে
একজন দরজি এগিয়ে এসে জানিয়ে গেলো সবই বাকীর খাতায়
সে বললো আরো
যে কোনো সময় হঠাৎ ধরে নিতে পারো

আমি খুলে নেবো তোমার ডান হাত
ওদের কথায় বাতাসে আমি কাঁপি থরোথরো
তারপর কপালে ভাজপড়া সুপ্রাচীন কালো ইটের ব্যাপারি
কাছে এসে দাঁড়ালো
এলো মগজ ব্যবসায়ী। হৃদপিন্ড ভিখারি চোখের খাতক
এলো তালাঅলা রাত্রির সুতার পথের মিস্ত্রি
ঋণ ঋণ ঋণ তুমি নিজেই আজ নিলামে উঠেছো
হিক হিক করে ওদের কন্ঠে শয়তান শাসালো
আমার জাল স্বাক্ষর ওদের হাতে ওদের হাতে আমার টিপসহি

দেউলিয়া হবার আগে দেখি ওরা
আমার হাত পা নখ লিঙ্গ চুল দাড়ি নাড়ি ও মগজ
সব খুলে খুলে পলিথিনে - চামিচে চামিচে তুলে নিল

জগতের অদ্ভুত অচেনা অজানা সেই সোনার মৌমাছি
হা হা করে উড়ে উড়ে চেঁচিয়ে চলেছে:
ধনতন্ত্রের ব্যাপকতর শীতল সংগ্রামে হায়, প্রকৃত আগুনের কি হবে?

শীতে পত্রমোচি কোনো এক গাছের উদ্দেশ্যে

আমাদের করুণাঘন শীতের কেমন মাথা ঘামছে আজ ঐ দেখো
কুয়াশায় ফর্সা হয়ে যাচ্ছে কপাল জামা কাপড়ের নিচে
ভিজে যাচ্ছে বুক পিঠ কুচকি ও রান
জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে তার ডিউটি শেষে ঘরে ফেরা গার্মেন্টসের ক্লান্ত
মেয়েগুলোকে দেখে
গুড়িগুড়ি আবছা ভাবনা ঝাপসা বেদনারাশি খেলা করে উঠেছে
মুখ থেকে বেরোনো হালকা কুয়াশার সাথে।

সব কিছুর মধ্যে ঝিনুকের অবতল ভাগের মতো ফকফকা শাদা এক
উদ্দেশ্য রয়েছে
তাই পৃথিবীতে মানুষের চোখে শাদা শাদা ভাব ফুটে থাকে।

শক্তির ব্যবহার যেখানে বেশি সেখানেইতো পরস্পরকে হত্যার কথা মনে
আসে
কিন্তু সব জ্বালানির মধ্যেই রয়েছে চরম ক্লান্তি
আর অজ্ঞতা দানা বেঁধে উঠলে বুদ্ধির ডালে বিষফল পেকে ওঠে।

খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হতে শেখো দেখবে আলো এসে তোমাকে খুঁজে
নিচ্ছে
যখনই অন্ধকার হাতছানি দেয় নিজের কথা ভাবো
রাতের আকাশের নিচে দাঁড়াও
দেখবে কিছু তারা মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলাচ্ছে
যে দাঁড়িয়ে গেছে তাকে জিজ্ঞেস করো না কিছু
নিজের কথা বলতে বলতেই সে আটকে গেছে।

তোমার জন্মই হয়েছে লক্ষ লক্ষ ব্যর্থতার মধ্যে।
তোমার চারিদিকে ঘাসের জন্য গাভীর ব্যর্থতা
ফুলের জন্য প্রজাপতির ব্যর্থতা
ভুগর্ভস্ত পানির জন্য গভীর নলকুপের ব্যর্থতা
ব্যর্থতা জ্বালানির জন্য যন্ত্রের, সুঁইয়ের জন্য সুতার,
রংয়ের জন্য কাপড়ের
দেহের জন্য আর্ট কলেজের ছাত্রদের আঁকা নির্ঘুম জলরংয়ের

যে সব ব্যর্থতার কথা বললাম তা বিশ্বাসে অকুন্ঠ থাকার জন্যই ঘটছে
বিশ্বাসের জন্য আছাড় খাচ্ছে যারা অবিরাম
বুঝে দেখ ওরাই তোমার বন্ধু
ওরা হলুদ পাতার মতো অকাতরে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে
দেশে দেশে নগরে মফস্বলে
শীতেই এসব টের পাই।

আজ পরম অযত্নের ভেতর শীত এসে আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরছে
বনভূমি কই সখা, সন্ধ্যা হতেই টায়ার পুড়িয়ে শীত ফেরানোর চেষ্টা করছো
দিনের শরীরে খন্ড খন্ড অবসন্ন রাত, রাতের পেটের ভেতর কর্মহীন
দিনের শুন্যতা
তুমি এসব বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতে গেলে
ঝড় ও ভূমিকম্পের মুখোমুখি হবে
দেখবে রাস্তাঘাটে অসংখ্য লোক একটা অদৃশ্য কিছুকে ধরার চেষ্টা করছে
কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়।

বলার আগে একবার দম নাও
তাহলে নিজের ব্যর্থতাকে হলুদ পাতার মতো উড়িয়ে দেবার স্বস্তি পাবে
শুরু করার আগে যদি একবার ভাবো দেখবে একটি লোক
হাসপাতাল থেকে ভালো হয়ে বাড়ি ফিরছে
ভাবতে ভাবতে কল্পনার ষাঁড়ের কুঁজের মাংশ আর কবুতরের জরায়ু দিয়ে
বানানো চপ খেতে খেতে
ভাবনা উড়িয়ে দাও, দেখবে তোমার ভাবনা অকাতরে ফলে যাচ্ছে
তোমার আশে পাশে যারা আছে প্রত্যেকেই খুব ভিতর থেকে আশাবাদী
হতে চায়
কিন্তু ওরা বস'ত পক্ষে হতাশ, ওরা একটি দম ফেলতে চায় তোমার
শিকড়ে
যেখানে মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের জন্ম, যেখানে বিধ্বস্ত হাহাকারের চাপ
সেই জায়গায় একটি টোকা দিতে চায়
যাতে তুমি কেঁপে ওঠো তুমি আর্তনাদ করে ওঠো ওদের বেঁচে থাকার
প্রানান্তকর চেষ্টা দেখে ওরা চায় তোমার পায়ের শিকড়ের চারদিকে গোল
একটি চলমান রেখা ফুটে উঠুক যেখানে বিগত দিন থেকে আনা সমস্ত
গল্প গুড়িয়ে গুড়িয়ে কাঁদছে

ঝড়াও শীতের পত্রমোচি গাছ সমবেদনার পাতা
মৃত্যুর জন্মদিন পর্যন্ত যেনো ধান ক্ষেতের দৃশ্য মনে থাকে
হাতল খুঁজতে খুঁজতে বন্ধ দরোজায় যেনো মাথা খুঁড়তে পারি
মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে যেনো বন্ধ দরোজার হাত বেরিয়ে আসে।

চিরন্তন সরল রেখা

শরীরে বাকল পড়ে দাড়িয়ে রয়েছে একটি অ্যাকাশিয়া
ছোট্ট সে একেবারে কিশোর পাতাগুলি ছাগল ছানার মতো লাফাচ্ছে
নিচে তার আলো করে দুটি ছোট্ট চকচকে পোকা

সমস্ত গাছপালা ঝুঁকে আছে আনন্দে কলিজা রঙের পাতায়
দখিনা বাতাসের ঘন ডাক, মাথা কাত করে মুসান্ডা
এলামন্ডার সাথে ফিসফিস করে হাসাহাসি করছে,
কানে হাওয়া লাগাচ্ছে ঘাসেরা, বিনোদনের, ব্যক্তিগত পাতায়
প্রতি পৃষ্ঠায় সমান বর্ণনা
প্রতিটা গাছই আজ একই সমাজের

পোকা দুটির একটি হলুদ কামিজ আর একটি কালো ট্রাউজার পড়েছে
ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা সরল রেখার জন্ম দিচ্ছে।
একটা চিরন্তন সরল রেখা।
পাশের পিপুল স্বাক্ষী, স্বাক্ষী গর্জন।

পশু পালনের দিন

আমারতো ছিলো না পাহাড়ে চড়ার বিদ্যা
তখন আমি নৌকা বাইতে পারতাম
নিজের জন্য একটি খাল খনন করতে করতে
দিন যেতো

আমি বৈঠা তুলে মাঝে মাঝে গান গাইতাম
কয়লা দিয়ে ভুতের ছবি এঁকে বশীকরণ চর্চা করতাম
রাতের বেলা পথে নামতাম পরীর পাখা কুড়াতে।
একদিন আমি উটের পিঠে চড়তে শিখবো বলে ঠিক করি।

উটের জন্য চাই মরুভূমি যেমন গরুর গাড়ির জন্য হারিকেন।
পড়শির বাড়িতে নাই বাবলার গাছ।
হরিণ পালতে দেখি কেওড়া গাছের প্রয়োজন।
কুমিরের জন্য দরকার চোখের পানি।
তিলে ঘুঘুর জন্য এক বিঘা জংগল।
সাপের জন্য তীব্র যৌন ফুল।

ঘুঙুরে রোচেনা মন তবু বুক ভরা ছোট্ট একটা পা খুঁজি
কিছুতেই দেবে না জানি তবু তার আঙ্গুল কখানি খুলে নিতে
রহস্য থেকে নামি, পকেটে রেঞ্চ, হাতে সৌখিন আঙ্গুলদানি।

প্রান্তরের ডাকবাংলায় খুঁজি শিশিরের নিশিথ
হঠাৎ হঠাৎ পাহাড়ি বরফের ডাক, চিলের চিৎকার
কিন্তু কোথায় প্রকৃতির মুখ চেপে ধরার ক্লোরোফর্ম ভেজানো কাপড়
যাতে শে না চেঁচায়?

শক্ত পাকস্থলি কই যাতে পাথরের গিঁট আর ফুলের তীক্ষ্ণ কামড় হজম করতে পারে?

ক্ষুধার চেয়ে গোল, ক্রোধের চেয়েও আন্তরিক
আনন্দের চেয়েও স্বচ্ছ, ভিখারিনির চেয়েও কপালহারা
কি সে কল্পনা ঘোর গাঢ় জ্যামিতি?
জীবনের কালো উচ্চারণ নিহিত কোন প্রতিত'লনায়?

পাহাড় থেকে যা সহজ উঁচু পাহাড় থেকে তা সহজেই দেখা যায়।
আমি আজো পাহাড়ে চড়িনি
নৌকা বেয়ে বেয়ে
চলে যাই - যেখানে নৌকা নাই সেখানে।
যেখানে আমি নাই সেখানে গিয়ে ঘুরে আসি।

একদিন আনারস

নির্জন যায়গা দেখে আমি একদিন আনারস ক্ষেতে ঢুকে
চুপ করে একটা আনারস হয়ে গেলাম
অনেকগুলো চোখ দিয়ে এক সাথে অনেক কিছু দেখবো বলে।

অনেকগুলো বেদনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো সম্ভাবনা
দেখছি এগারোটার সূর্য একদিকে টগবগ করে ফুটছে
দেখছি একদিকে বাতাস বইছে ফুলের রেণু নিয়ে
একদিকে শালের অরণ্য। এক দিকে শব্দ। শো শো। কিসের যেন।
সাবলীল বেদনা যখন সৃষ্টিশীল হয়েছিলো
নিশ্চয়ই অনেক কিছু মিলে এমন একটা
মহান একাকিতার জন্ম হয়েছিলো
বহুদিকে তাকাতে তাকাতে আমি কেবল একের কথাই ভাবলাম।

মনে হয় আমার অনেকগুলো চোখ হলেও একটাই মাত্র চোখ
অনেকগুলো সংবেদন হলেও একটাই মাত্র অনুভব।

দেখি উপরের সাথে নিচের কোন মিল নেই।
কাছের সাথে দূরের কোনো তুলনা হয় না।
দিনের থেকে রাত পুরোটাই আলাদা।
অনেকগুলো চোখ দিয়ে আনারসের মতো দেখলে
অনেক রকম ভাবনাকে রূপ নিতে দেখা যায়।
অনেক রকম দেখা যায়। অনেক কিছু দেখা যায়।

কুয়াকাটার সূর্যাস্ত কেনো লাল হয়ে ওঠে

সাগর পাড়ে লোকটা করছে কি
তো দাউ দাউ করে জ্বলছে কেনবা পূবের পানি?
নারকেল বনে বাতাস নতুবা জেলেদের গানে
গলদা চিংড়ির রেণু ধরছে কে ঐ গগণে!

বালির উপর পা ছড়িয়ে বসেছে সে ভোরে
একনিষ্ঠ মেকানিক যেনরে
খুলছে বসে বসে ঢেউয়ের তরঙ্গে বাবুইয়ের বাসা
উড়ছে এঁকেবেঁকে সোনালি খড় কতো রকমের সে খুলছে
বুদ্ধের মন্দিরের সামনে বসে সোনার সুঁই তার আশা।

সিগাল চমকায়, রুদ্ধশ্বাসে দেখে
একে একে সুন্দরী কিশোরীর শরীর থেকে
লেহাঙ্গা ছুড়ে ফেলে সে যে
উরুসন্ধির হালকা রোমের উপর চুমু খেতে খেতে
অস্ত গেলো কি যে ভালোবেসে

কুয়াকাটা কি ভোর? কুয়াকাটা কি কালো?
পশ্চিম দিগন্তে লাল রক্ত ছিটিয়ে
একই ফ্রেমে যেন সূর্যাস্ত হলো!

রাধুনি রাধা

সকালে এসে দেখতাম তুমি রান্না করছো।
চুলার উপর কিছু একটা চড়ানো আনন্দে তা ফুটছে।
পাশের ঘরে সেই ঘ্রাণ আমার বসার আয়ু বাড়িয়ে দিতো।

আমাকে বসিয়ে রাখতে অপেক্ষার ঘরে
অনেকগুলি আমি বসে থাকতে থাকতে তাসের মতো এলোমেলো হয়ে যেতাম
কালো সাতের উপর লাল আট বসানোর ধৈর্যের খেলা খেলে
রহস্যময় থিমগুলি পাশাপাশি দাঁড় করাতাম সাথে এসে মিশতো
ধুধুসর অতীত কাল কতোক্ষণ এসেছি অথচ দেখা নেই
রঙীন হৃদয়হীনতা কি যে করছো অত দুরে
ছাই দিয়ে মেঝেতে লিখছো বুঝি আমার নাম
পানির ধারার নিচে কার লাফানোর শব্দ
গোসল সেরে তুমি বাইরে এসে দাঁড়ালে কি
আমাকে ডাকলে নাকি বললে: এসে দেখ!

কমলা লেবু তুমি সারাসকাল কি নিজেকেই রেঁধেছো
আমার সামনে আসবে বলে?
প্লেটে করে নিয়ে এলে তোমার শাদা গোল চোখ দুটি!

কোন এক উনুনের শিখা এখনও ভাপ ছড়াচ্ছে গুনগুন করে
তোমার গালে ও কপালের লালে
আমি তোমার সামনে বসে
চুপচাপ সুঘ্রাণ নিতে গিয়ে
একটু একটু করে আগাচ্ছি।

উপমার জগৎ

সাবধান তোমরা কবিতা বাণী ঐশী মনে করো না
তাহলে পাঠকের গজব তোমাদের ওপর।
তোমার মাতৃভাষাতে সমগ্র জাতির বৈশিষ্ট নিহিত।
আমরা আবারো বলছি, অতীতের বহু কবি নিজেকে চেনাতে পারেনি
শুধু মাত্র ভাষাকে না বোঝার জন্য,
ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের হাহাকার
পুস্তক প্রকাশের দিকে নিজেকে ব্যস্ত রেখো না
আত্মপ্রকাশের পূর্বে বারবার ভাবো নিজেকে।

নতুন বিষয় উদ্ভাবন করো পুরানো কোন বিষয় শরীরে অনুভব করে
দেখবে নতুন দাঁত পেয়ে ম্লান উপমা কেমন খলখল করে হেসে উঠেছে

যার সাথে অন্তরঙ্গতা হয়নি, অতঃপর সেই সব বিষয়
তোমার জন্য নিষিদ্ধ করা হলো
নিষিদ্ধ বস্তুকে মাত্র জ্ঞান দিয়েই উন্মোচন করা যায়
আর তখন তা হয়ে ওঠে রক্তের আলো।
যা রৌদ্র দগ্ধ দিন পেরিয়ে এসেছে অথচ ম্লান হয়নি, তার খোঁজ করো
যেমন কিছু কিছু উপমা - এ এক আশ্চর্য জগৎ - পৃথিবীর সব
বিজ্ঞানী বা রাজনীতিকও সারা জীবন একটা ভালো উপমার অন্বেষন করে

কিন্তু কবিই প্রকৃত পক্ষে এর সৌন্দর্যে চিৎকার করে ওঠে
ভালো কবিতার প্রথম গুণ উন্মোচন।
ভালো কবিতার প্রথম লক্ষণ বিদ্রোহ।

স্মরণাঞ্জলী

সভ্যতা সৃজনে পশু পাখী গাছ জলাশয়
খনি অথবা মেঘের অবদান অনস্বীকার্য

সভ্যতা চেয়েছে বহু অন্ধকার বহু বহু ইচ্ছার মৃত্যু
যুদ্ধাস্ত্রের জন্য অনেক খনিজ
অনেক নদী হারিয়ে গেছে বাঁধ দেখে

যে পাতা ফলের দাবীতে হলুদ হয়েছে
তাপের ঢেউ দিতে গিয়ে নক্ষত্রের ওজন কমেছে যেখানে
বালিতে পরিনত হয়েছে যে সব বিব্রত পাথর
মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সমর্থনে

ওরা সবাই সভ্যতার শহীদ
হঠাৎ কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে ওদের জন্য আমার বুক টনটন করে

আমার মাথা ভারী হয়ে নামে ওদের কথা ভেবে।

বিগত

আরে এটা কে? তোমার শিশুপুত্র বুঝি? তাহলে তো ওর
নতুন দিনের থুতনি নেড়ে
মোহনার কাছে বেড়ী বাঁধের উপর গজানো আকন্দ পাতার পাশে
দাঁড়ানোর একটু অনুভূতি নিতে হয়!

এসো এসো
ভালই হলো
আমার সেই শেলাই করা চেরা যায়গাটা আজা ড্রেসিং করার দিন

দেখতে পাচ্ছি ও যেনো নিজেই রহস্য খোলার রেঞ্চ
খরগোসের মতো নিখুঁত চোখ দুটিতে
নিমফুলের পিঙ্গল নীল দুফোঁটা মধূ বুঝি
হাসছে মৌরী ফুলের মতো
ওর মুখে কি আমার তোমাকে ভালবাসার কোন চিহ্ন আছে?
না না আমাকে দেখে তুমি এতো দিন পর কেঁপে উঠো না

সত্য বিনষ্টকারী শিশুটিকে আমি ভালো করে দেখি
যার জন্য তোমাকে আসতে হয় নীল পোকার ছদ্মবেশে
আমার ঘুমের ভিতর
অজানা সাঁকোর দিকে গেলেও
নিষিদ্ধ পারদঘন সোনালি বিহ্বল মদ আমার
আজ তুমি বিগত প্রাণ

তোমার মুখখানি যেনো ভেজা ভেজা খুব কান্না পায় বুঝি?
বৈশাখের বিকাল ভরে ওঠে প্রাচীন চৈত্রের ধুলায়?

তুমি যা বলতে পারলে না, তা বলে দিলো তোমার ছেলেটি
গালের ওপর দুষ্টুমীর কাটা দাগে একটু হেসে উঠে!

কপালের চোখ

নগরীর প্রধান ফোয়ারায় একটি ব্যাঙ সোডিয়াম আলো দেখে
বলেছিল: দিনেও এমন আলো দেখি নাই ভাই
অন্য ব্যাঙটি আহলাদে ভাবে: তাইতো তাইতো তাই
এমন মহৎ কাজ যার মাথা থেকে এলো
চোখ কপালে তুলে তাকে সালাম জানাই

সেই থেকে ব্যাঙের দুচোখ কপালে। ফোয়ারা
দেখলেই বালকদের উচিৎ সেখানে ব্যাঙ ছেঁড়ে দেয়া।

পানিদেশ ভ্রমণ

হাইল হাওড় থেকে এক মুঠো পীট মাটি তুলে নেই হাতে
এরকমই পেয়েছিলাম কিছুদিন আগে বরিশালে - সাতলা আর বাগদা
নদীর কাছে
এমনই কালো মাটি - হালকা - যেন স্পর্শ সেই হাহাকার হাতের
যার ত্বক বাদামি হয়েও রোগা নীল
নক্ষত্রের বারান্দা রাতের বাড়ি আমি এখনো পার হতে পারি
অযুত চিন্তার নদী - যার নাম মধুমতি চন্দনা কুমার চিত্রা
আত্রাই গোপলা লংলা মনু ঘাঘর সন্ধ্যা
নোনা আর আধো স্বাদু পানিতে চোখ ধুয়ে দেখি
তুমি নিলীমার কেবিন সুদ্ধ চলেছো কোথাও

আকাশের নিচে তোমার মেঘলা সবুজ পেট - একটু উপরে লাল টিলা
নীল পুকুর
লজ্জাস্থান ঢাকা আম বাগানে কুহেলী অপরাহ্ন
শর্ষের একটি ঝলক
সীসার নদীতে

তোমার পানি যে কতো রকম - কতো রকম
নদী হয়ে বয়ে চলেছো তুমি পানি পরী
আমি জানি - জানি - তবু ভেবে দেখি চেয়ে দেখি শুনি
সমুদ্রের পানি আর মোহনার পানি একই রকম প্রায়
রয়েছে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা, হাত পা দাঁত
ক্রোধের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে
তার পর ফিক করে হেসে ওঠে শে
আমার মতো

দৃশ্যতত্ত্ব

হাফপ্যান্টের একটি বালক ঢিল ছুঁড়ে দোকান পার হয়ে গেলে
রাস্তার মোড়ের সেই যুবকের মনে হয়েছিলো
মুদি দোকানগুলো যেনো চুপচাপ শান্ত কিশোরী

কাপড় শুকাচ্ছে কে ওখানে উঠানের তারে - সেখানে
দুটি কাক স্তব্ধ হয়ে কেনো যে মুখোমুখি
নইলে কি সম্পূর্ণ হতো না এই দিন!
দৃশ্যটিকে পরিপূর্ণতার দিকে পাঠিয়ে দেবার জন্য
পাথর গড়িয়ে পড়েছিলো যেনো

প্যান্টের পকেট থেকে হাত টেনে বের করে
বাতাস কেটে কেটে জানালার পাকা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে
মনে হলো এ শুধু স্মৃতি স্মৃতি
বহুযুগ আগে এরকম হয়েছিলো তখন আমাদের খুব ছেলেবেলা
আবার বহুযুগ পরে হয়তো বা এরকম হবে
আজ এর কোন অর্থ কোথাও পাবো না।

খোলামিল

দরোজাটা খুলছে আর লাগছে আর খুলছে বারবার
খুলতে পারার মধ্যে
বীজের সাথে গাছের
পুকুরের সাথে মাছের
তীরের সাথে হাঁসের
গাভীর সাথে ঘাসের যেমন মিল
সেই রকম লাগাতে পারার মধ্যে
তোমার আমার মিল করে ঝিলমিল!

জীবন সড়ক থেকে কবিতা রাস্তা
সূর্য উঠবে কিন্তু ভোর হবে না

ছিলিম পুর থেকে জীবন সড়ক। তা থেকে একটি রাস্তা
কবিতার দিকে গেছে।
ভ্রমনের কালি থেকে রাস্তাটির জন্ম - পাড়াগাঁর রস
আর কোড়ালের গল্প শুনে শুনে
পুরানো গাছের ছায়া বড় হয়ে উঠেছে।

এই রাস্তার ওপর প্রথম দাঁড়িয়ে ছিল যে মানুষটি
আমি তারই কথা ভেবে খুব আপ্লুত হই
এর উত্তর দিকটা ছেলে দক্ষিণ দিকটা মেয়ে
একটা দিক ছড়িয়ে গেছে শীতে
একটা দিক হারিয়ে গেছে বসন্তে

অতি প্রাচীনতা থেকে আজকের দিনের দিকে আসতে গিয়ে
চলে এসেছি খুব সন্নিকটে
এসে দেখছি আমার ভিতরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে ভয়ে
সামরিক তিষি ক্ষেতে আমরা
সূর্য উঠবে কিন্তু ভোর হবেনা

মানুষ কি একটা জায়গায় দাড়িয়ে থাকবে?
পেন্সিলের দাগের মতো
বিস্মৃতির রবারের সামনে থরথর করে কাঁপবে?

জাফলং বিষয়ে একটি কবিতা কিভাবে লেখা যায়

জাফলং যেতে পাথরটিলা বাজারের কাছে গাড়ি থামাতে হলো।
তাকিয়ে দেখি দূরে দুটি টিলার মধ্যে মাকড়শার আঁশের
একটি ঝুলন্ত হাসি-খুশী ব্রীজ। ব্যাঙের ছাতার মতো
মাটির টিলার গায়ে শিশুদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি।
পুরনো টাই পড়া সাহেব মতো লোকটা
ট্রাক থেকে নামলো।
আবার চরাই উৎরাই, স্থানীয় নিসর্গ ও তাতে সম্পাদনার ছাপ।

সকালেই পাখিগুলি ডাকছে।
খুব নামকরা এই জায়গাটা নিয়ে লেখা পাহাড়ে ঘর বাঁধবার মতোই।
যে কোন ঘরই শিশুদের ঘর হয়ে যায়।
বিশালতা নয়, গভীরতার দিয়েই নিসর্গ জেগে ওঠে।

জাফলং এর কাছাকাছি হাফলং কোথায় পালিয়ে আছে?
একটা জায়গার মতো আরেকটা কি দেখা যায়?
প্রকৃতি কি দ্বৈত সত্তার পক্ষে?

একটা মানুষের মতো আরেকটা মানুষ কোথায়
একটা কবিতার মতো আরেকটা কবিতা?

শীতকালীন জাফলং বিষয়ে লিখতে গেলে দুটি কবিতা লিখতে হবে
শীতকাল ও জাফলং। তারপর লিখে কেউ যদি মনে করে আমি একটি
লিখবো
তখন দুটির কিছু কিছু লাইন বাদ দিতে হবে কাঠুরের মতো।

মাঝারী আকারের একটা ক্ষেত দাঁড়িয়ে গেলে যদি মনে হয় এটা ফসলের
তুলনায় ছোট হয়ে গেছে তাহলে শেষ কয়েকটি লাইনের আগে ঢুকাতে
হবে এমন কিছু শাকসব্জী
যাতে পাঁচশো বছর আগেকার জাফলংকে এক ঝলক বোঝা যায়।
যদি আকারে বড় হয়ে গেছে বলে মনে হয় তবে কবিতার দশ থেকে
তিরিশতম পংক্তির
সব কিছুকে সাজিয়ে নিতে হবে এমন করে যাতে বেশি কথা না বলে।

কবিতার ছন্দ হবে খাসিয়া ছন্দ অর্থাৎ যে ছন্দ
গড়াগড়ি খাওয়া কমলা এবং নদীর বুক ভর্তি
পাথরের রূপ ভেদ করবে।